দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

মসজিদভিত্তিক প্রাইমারী শিক্ষা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, বর্তমান পরিস্থিতি ও সমস্যা পর্যালোচনা করে ইহার সার্বিক উন্নতিকল্পে সুপারিশ প্রদানের জন্য "জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ" গঠন করেছেন। এ পরিষদে দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গকে রাখা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। স্বাধীনতার দুইদশক পরেও বস্তুত পক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে তেমন কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ইতিপুর্বে নেওয়া হয় নাই। বৃটিশ উপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থাই এখনও বিরাজ করছে। তদুপরি স্বাধীনতার পর বিভিন্ন কারণে সামগ্রিক শিক্ষার মান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনিয়ম-অব্যবস্থা চরম আকার ধারণ করেছে। ফলে, শিক্ষা ক্ষেত্রে চলছে এক নৈরাজ্য। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

আমাদের মত দরিদ্র দেশে সাধারণতঃ কোন বড় সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গ চিন্তা করলে সঙ্গে সঙ্গেই অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ এসে যায়। বড় সমস্যা দূর করার জন্য বড় ধরনের পরিকল্পনা করা হয়। সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বড় ধরনের বাজেট দরকার হয়। আর আমাদের মত দরিদ্র দেশে সে বাজেট সংগ্রহ করা অসম্ভব বিধায় অনেক প্রস্তাব পরিকল্পনাই বাস্তবের মুখ দেখে না।

'২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা' এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান সরকার প্রাইমারী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ জন্য বাজেট কত করা হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু বর্তমান প্রাইমারী স্কুলগুলিতে ছাত্র সংখ্যার যে চাপ পরিলক্ষিত হয় তাতে স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণ করলেও সংকুলান হবে বলে মনে হয় না।

এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি একটি বাস্তবমুখী প্রস্তাব জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের নিকট পেশ করতে চাই। তার পূর্বে ভূমিকা হিসাবে বলতে চাই যে, প্রাইমারী শিক্ষার জন্য বর্তমানে সরকারীভাবে সর্বমোট কত টাকা ব্যয় হচ্ছে তা সরকারের নিশ্চয়ই জানা আছে। এ পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে আমরা বাংলাদেশের সার্বিক শিক্ষার হার ২২-২৩% শতাংশ-এর উপরে উঠাতে সক্ষম হই নাই। অথচ বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ৬০-৬৫% শতাংশ লোক আরবী ভাষায় 'কায়দা' 'ছিপারা' বা কোরআন শরীফ পাঠ করতে পারে। এটা সম্ভব হয়েছে দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণে। অর্থাৎ গ্রামীণ মসজিদে মক্তব ও গৃহ শিক্ষকের প্রচেষ্টায়। অথচ এ খাতে কিছুদিন আগেও সরকারী অনুদান বা সাহায্য ছিল শূন্যের কোটায়। সুতরাং একটি ব্যাপার অত্যন্ত স্পষ্ট যে, বিনা অর্থ ব্যয়ে ৬০-৬৫% শতাংশ লোক যে পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করে একই পদ্ধতিতে প্রাইমারী শিক্ষা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হলে উল্লেখিত সুফল লাভ করা এ ক্ষেত্রেও সম্ভব। বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি নিম্ন থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহলে দেশ ও জাতি অল্প সময়ে ও অল্প খরচে অধিক সুফল লাভ করতে সমর্থ হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামসহ সকল প্রাইমারী স্কুল, গ্রামের সকল মসজিদ ও মক্তবগুলির তালিকা সংগ্রহ করতে হবে। বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশে সর্বমোট ২ লক্ষাধিক মসজিদ আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি গ্রামে অন্ততঃ পক্ষে এক বা একাধিক মসজিদ আছে। এসকল মসজিদের অনেকগুলির সঙ্গে সংলগ্ন মক্তব আছে। এগুলিও তালিকাবদ্ধ করতে হবে। মুয়াজ্জিনসহ ২

এ, এইচ, এম, রফিক

জন নির্ধারিত লোক নিয়োগ করা আছে। আর ইমামগণের অধিকাংশই শিক্ষিত। যাঁরা প্রাইমারী স্তরে শিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত— এই সকল মসজিদকে কেন্দ্র করে যদি প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তা হলে সরকার স্কুল ঘর তৈরী বাবত কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারেন। তদুপরি শিক্ষকের নিয়োগদানের ও সকল আনুসঙ্গিক খরচ ও কাজ অনেক সহজতর হতে পারে। যে সকল মসজিদ সংলগ্ন মক্তব আছে, সে সকল স্থানে মক্তবকেও পাশাপাশি স্কুলের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। মসজিদ ও মক্তব উভয়টি মিলিয়ে সুন্দরভাবে শ্রেণীমত শিক্ষাদান সম্ভব।

যে সকল মসজিদে বারান্দা নাই সেগুলিতে অস্থায়ীভাবে স্থানীয় ভিত্তিতে মসজিদ সংলগ্ন কম খরচে কাঁচা চালাঘর নির্মাণ করা যেতে পারে। কোন কোন মসজিদে অস্থায়ী দেয়াল সৃষ্টি করে শ্রেণী ভাগ করা যেতে পারে। বলাই বাহুল্য যে, মসজিদে শিক্ষার জন্য টুল-টেবিলের কোন প্রয়োজন পড়বে না। বড়জোর চাটাই ব্যবহার করা যেতে পারে।

মসজিদের চতুষ্পার্শের বাড়ীগুলিকে সীমানা নির্ধারণ করে দিলে সুবিধা হবে। যাতে কোন বাড়ী বাদ না পড়ে। এই সীমানার মধ্যে প্রাইমারী স্কুলে যায় না এমন সব শিশুকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই সীমানাভুক্তির ব্যাপারে মসজিদ সংলগ্ন নহে এমন মক্তবগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে যদি মক্তবের শিক্ষক প্রাইমারী শিক্ষা প্রদানে উপযুক্ত হন তবে তিনি নিজেই শিক্ষকতা করবেন। অন্যথায় সেখানে অন্য শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিন, বা মক্তবের শিক্ষকগণ মাসোহারা হিসাবে বর্তমানে স্থানীয়ভাবে যা পাচ্ছেন তার সাথে আরো অতিরিক্ত কিছু সরকারী ভাতা দেয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে ক্ষেত্রবিশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ভেদে ২/১ জন অতিরিক্ত শিক্ষকও নিয়োগ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কতিপয় ব্যক্তিগত অবশ্য মসজিদগুলিকে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা সম্পর্কে আপত্তি তুলতে পারে। এ ক্ষেত্রে বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা যেতে পারে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) যে সমাজ গঠন করেছিলেন তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদ। মসজিদে তিনি শুধু নামাজই পড়তেন না যাবতীয় শিক্ষা, সামাজিক কাজকর্ম, বিচার আচার সবকিছুই সম্পন্ন করতেন। ইসলামে বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করাকে ফরজ করা হয়েছে। আর এ ফরজ আদায়ের জন্য মসজিদের চেয়ে উত্তম স্থান আর কি হতে পারে?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মসজিদভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু করার পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে সরকার বা কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত সাবধানতা ও সচেতনতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। এ ব্যাপারে মসজিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এমন কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

তদুপরি মসজিদের ইমাম সাহেবদেরকে এ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা প্রদান করা যেতে পারে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ যে সব মসজিদে আছেন সেগুলোতে প্রথম পদক্ষেপ নিলে সুবিধা হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন সাহায্যদাতা সংস্থার লোক বা সরকারী কর্মকর্তাগণ প্রথমেই সরাসরি হস্তক্ষেপ করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ বা আলেমগণের মাধ্যমে কর্মসূচী শুরু করলে অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে।

এ কর্মসূচী কেবলমাত্র তখনই কৃতকার্য হতে পারে যদি দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজকে এ ব্যাপারে কাজে লাগানো সম্ভব হয় এবং তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। প্রতিটি অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষকে যদি তার চতুষ্পার্শের নিরক্ষর শিশুদের অক্ষর জ্ঞান দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায় তখনই এ কাজ সহজতর হতে পারে। এ জন্য প্রচার মাধ্যমগুলি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষার্থী শিশুরা কর্মজীবী হলে একইভাবে ঐ মসজিদে বৈকালীন বা নৈশ বিদ্যালয়েরও ব্যবস্থা করা যায়। বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে স্থানীয় মসজিদ ও মক্তবগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। মসজিদে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে গ্রামের মুসল্লিগণ সমবেত হন। অথবা ইচ্ছা করলে সন্ধ্যার সময় সমবেত করা যায়। সেখানে যদি কর্মজীবী শিশুদের পাশাপাশি বয়স্কদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে উভয় ক্ষেত্রে কাজটি সহজতর হবে।

মসজিদভিত্তিক প্রাইমারী শিক্ষা কার্যক্রম যদি যথাযথভাবে চালু করা সম্ভব হয় এবং পরবর্তীকালে কার্যকর তত্ত্বাবধান করা হয় তবে ইহা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে যুগান্তকারী ফলাফল বয়ে আনতে পারে।